উমাইয়া খেলাফত

ড. সুহাইল তাক্কুশ

উমাইয়া খেলাফত

অনুবাদ
মুজিব মাহমুদ

ভাষাবিন্যাস
আলমগীর মুরতাজা

চেতনা
প্রকাশন

বই	: উমাইয়া খেলাফত
লেখক	: ড. সুহাইল তাক্বুশ
অনুবাদ	: মুজিব মাহমুদ
ভাষাবিন্যাস	: আলমগীর মুরতাজা
সজ্জাবিন্যাস	: আবু আফিফ মাহমুদ
প্রকাশকাল	: অক্টোবর ২০২৩
প্রকাশনা	: ৩৯
প্রচ্ছদ	: আহমাদুল্লাহ ইকরাম
প্রকাশনায়	: চেতনা প্রকাশন দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা) ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক	: মাকতাবাতুল আমজাদ ✆ ০১৭১২-৯৪৭ ৬৫৩
অনলাইন পরিবেশক	: ওয়াফিলাইফ

মূল্য : ৩৬০.০০৳

Umaiya Khelafot by Dr. Suhail Taqqush
Published by Chetona Prokashon.
e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657; 01303-855 225

ISBN : 978-984-98011-8-4

উৎসর্গ

আমার নাতি মুহাম্মদের প্রতি—
এ বই আমাদের সে সকল পূর্বসূরির সমুজ্জ্বল কাহিনিকাব্য, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মূল্যবান সম্পত্তিগুলোর সংরক্ষণে যারা ব্যয় করেছেন অসামান্য শ্রম-সাধনা।

এ আলোকময় পৃষ্ঠাগুলো পরম ভালোবাসায় তোমাকে উৎসর্গ করছি—বড় হয়ে তুমি যেন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে পারো ইসলামের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস এবং তার ছায়াতলে লাভ করতে পারো গভীর আত্মিক প্রশান্তি।

আশা করছি—এ বই তোমার জন্য তৈরি করবে এমন এক দীপ্তিময় প্রদীপ, যার স্নিগ্ধ আলোয় মসৃণ ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হতে পারবে তুমি।

...সূ চি প ত্র...

লেখকের ভূমিকা ১৩

প্রথম অধ্যায়

মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা.

[৪১-৬০ হিজরি/৬৬১-৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ]

মুআবিয়া রা.-এর পরিচয় ২১
উমাইয়া খেলাফতের প্রতিষ্ঠা ২৩
মুআবিয়া রা.-এর রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি ২৪

মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাবলি

ক. খারেজিদের আন্দোলন ২৭
খ. শিয়া আন্দোলন ৩০
গ. ইরাকের বাহিরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ৩১
ঘ. পরবর্তী খলিফা হিসেবে ইয়াজিদের বাইআত ৩২
সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতাগুলো ছিল ৩৩

মুআবিয়া রা.-এর পররাষ্ট্রনীতি

ভূমিকা ৩৬
পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গন ৩৭
বাইজেন্টাইন রণাঙ্গন ৩৮
মুআবিয়া রা. দুটি লক্ষ্য স্থির করেন ৩৯
উত্তর-আফ্রিকান রণাঙ্গন ৪৫
হজরত মুআবিয়ার প্রশাসনিক নীতি ৫০
মুআবিয়া রা.-এর মৃত্যু ৫১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়া

[৬০-৬৩ হিজরি, ৬৮০-৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ]

ইয়াজিদের পরিচিতি..... ৫৩

ইয়াজিদের সময়ে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাবলি

ক. কারবালা ট্রাজেডি..... ৫৫
কারবালা ট্রাজেডির পর্যালোচনা..... ৬১
খ. মদিনাবাসীর বিদ্রোহ : হাররার ঘটনা..... ৬৫
গ. আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা.-এর আন্দোলন..... ৬৭
ইয়াজিদের শাসনকালে পররাষ্ট্রনীতির ঘটনাবলি..... ৬৯
ইয়াজিদের মৃত্যু..... ৭১

মুআবিয়া বিন ইয়াজিদ : দ্বিতীয় মুআবিয়া

মারওয়ান বিন হাকাম

মারওয়ানের পরিচিতি..... ৭৪

মারওয়ানের সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ

ক. জাবিয়া কনফারেন্স..... ৭৬
খ. মারজ রাহিতের যুদ্ধ..... ৭৭
গ. মারজ রাহিত যুদ্ধের ফলাফল..... ৭৯

তৃতীয় অধ্যায়

আবদুল মালিক বিন মারওয়ান

[৬৫-৮৬ হিজরি/ ৬৮৫-৭০৫ খ্রিষ্টাব্দ]

পরিচিতি..... ৮১
আবদুল মালিকের শাসনকালের শুরুভাগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি..... ৮২
আবদুল মালিকের সময়ের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাবলি..... ৮৩
প্রথমত : আলাবিদের বিরোধিতা..... ৮৩

ক. ইরাকে শিয়া আন্দোলন : আইনুল ওয়ারদা যুদ্ধ ৮৩
খ. মুখতার বিন আবু উবাইদ সাকাফির আন্দোলন ৮৬
দ্বিতীয়ত : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের শক্তিশালী ভিত্তি ৯৩
তৃতীয়ত : খারেজি সম্প্রদায় ৯৫
ক. আজারিকা খারেজি দল ৯৬
খ. সুফরিয়া খারেজি দল ৯৭
গ. ইয়ামামার খারেজি দল ৯৮
চতুর্থত : আবদুর রহমান বিন আশআসের বিদ্রোহ ৯৮
আবদুল মালিকের বৈদেশিক নীতি ১০২
ক. পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গন ১০২
খ. বাইজেন্টাইন রণাঙ্গন ১০৩
গ. উত্তর-আফ্রিকান রণাঙ্গন ১০৬
আবদুল মালিকের প্রশাসননীতি ১০৯
ক. প্রশাসনিক বিভাগের উন্নতি ১০৯
খ. হারাকাতুত তারিব বা আরবায়ন আন্দোলন ১১০
১. প্রশাসনের আরবিকরণ ১১০
আরবি মুদ্রার প্রচলন ১১১
পরবর্তী খলিফা নিয়োগ : আবদুল মালিকের মৃত্যু ১১৩

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক

[৮৬-৯৬ হিজরি—৭০৫-৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ]

ওয়ালিদের পরিচিতি ১১৫
অভ্যন্তরীণ সংস্কারকর্ম ১১৬
ওয়ালিদের পররাষ্ট্রনীতি ১১৮
ক. পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গন ১১৮
ট্রান্স-অক্সিয়ানা অঞ্চল জয় ১১৮
সিন্ধু বিজয় ১২২
খ. বাইজেন্টাইন রণাঙ্গন ১২৫
গ. উত্তর-আফ্রিকার রণাঙ্গন ১২৬

স্পেন বিজয়

বিজয়-পূর্ব স্পেনের অবস্থা

এক. রাজনৈতিক অবস্থা ১২৯
দুই. সামাজিক অবস্থা ১৩০
তিন. ধর্মীয় অবস্থা ১৩২
বিজয়াভিযান ১৩২
স্পেন বিজয়ের প্রভাব ১৩৭
পরবর্তী খলিফা নিয়োগ : ওয়ালিদের মৃত্যু ১৩৯

পঞ্চম অধ্যায়

সুলাইমান বিন আবদুল মালিক

[৯৬-৯৯ হি./৭১৫-৭১৭ খ্রি.]

সুলাইমানের পরিচিতি ১৪১
সুলাইমানের অভ্যন্তরীণ নীতি ১৪২
সুলাইমানের পররাষ্ট্রনীতি ১৪৪
ক. পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গন ১৪৪
খ. বাইজেন্টাইন রাণাঙ্গন ১৪৪
পরবর্তী খলিফা নিয়োগ : সুলাইমানের মৃত্যু ১৪৯

উমর ইবনে আবদুল আজিজ

পরিচিতি ১৪৯
উমর ইবনে আবদুল আজিজের সাধারণ নীতি ১৫৪
উমর ইবনে আবদুল আজিজের মৃত্যু ১৬১

ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালিক : দ্বিতীয় ইয়াজিদ

পরিচিতি ১৬২
দ্বিতীয় ইয়াজিদের শাসনামলে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ১৬২
ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবের বিদ্রোহ ১৬২
আব্বাসীয় দাওয়াত প্রকাশ ১৬৫

দ্বিতীয় ইয়াজিদের পররাষ্ট্রনীতি ১৬৭
পরবর্তী খলিফা নিয়োগ : দ্বিতীয় ইয়াজিদের মৃত্যু ১৬৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

হিশাম বিন আবদুল মালিক

[১০৫-১২৫ হি.—৭২৪-৭৪৩ খ্রি.]

পরিচিতি ১৬৯
হিশামের শাসনামলে উমাইয়া সালতানাতের অবস্থা ১৭০
অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ১৭০
আলাবিদের সঙ্গে সম্পর্ক ১৭০
দেশের বাইরের পরিস্থিতি ১৭২
ক. পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গন ১৭২
খ. আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান রণাঙ্গন ১৭৫
গ. বাইজেন্টাইনবিরোধী রণাঙ্গন ১৭৫
ঘ. উত্তর-আফ্রিকার রণাঙ্গন ১৭৭
ঙ. আন্দালুসিয়ার রণাঙ্গন ১৭৭
পরবর্তী খলিফা নিয়োগ : হিশামের মৃত্যু ১৮১

সপ্তম অধ্যায়

দ্বিতীয় ওয়ালিদ : তৃতীয় ইয়াজিদ : দ্বিতীয় মারওয়ান

দ্বিতীয় ওয়ালিদ খ্যাত ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদ

[১২৫-১২৬ হি.—৭৪৩-৭৪৪ খ্রি.]

দ্বিতীয় ওয়ালিদের পরিচিতি ১৮৩
দ্বিতীয় ওয়ালিদের কার্যাবলি : তার সমাপ্তি ১৮৩

তৃতীয় ইয়াজিদ খ্যাত ইয়াজিদ বিন প্রথম ওয়ালিদ

তৃতীয় ইয়াজিদের পরিচিতি ১৮৬
তৃতীয় ইয়াজিদের শাসনামলে সাধারণ পরিস্থিতি ১৮৬

মারওয়ান বিন মুহাম্মদ জুদি : দ্বিতীয় মারওয়ান

দ্বিতীয় মারওয়ানের পরিচিতি.....১৯০
দ্বিতীয় মারওয়ানের শাসনামলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি.....১৯০
ভূমিকা.....১৯০
হিমসবাসীর বিদ্রোহ.....১৯২
গুতার জনগণের বিদ্রোহ.....১৯৩
ফিলিস্তিনবাসীর বিদ্রোহ.....১৯৩
ইরাকের দাঙ্গাহাঙ্গামা.....১৯৪
ক. খারেজিদের আন্দোলন.....১৯৪
খ. আলাবি আন্দোলন.....১৯৫

উমাইয়াদের অভ্যন্তরগত আন্দোলন

আবদুল্লাহ বিন উমর বিন আবদুল আজিজের আন্দোলন.....১৯৬
সুলাইমান বিন হিশাম বিন আবদুল মালিকের আন্দোলন.....১৯৭
দ্বিতীয় মারওয়ানের শেষ পরিণতি.....১৯৮

অষ্টম অধ্যায়

উমাইয়া খেলাফতের পতনের কারণ

ভূমিকা.....২০১
প্রথম কারণ : উমাইয়া পরিবারের অভ্যন্তরীণ সংঘাত.....২০২
দ্বিতীয় কারণ : একসঙ্গে দুজনকে যুবরাজ নিযুক্তি.....২০৮
তৃতীয় কারণ : গোত্রীয় সংঘাত.....২১০
চতুর্থ কারণ : উমাইয়াদের আরবপ্রবণতা.....২১৪
ক. রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতা.....২১৪
খ. অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি.....২১৬
গ. সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি.....২১৮
পঞ্চম কারণ : ধর্মীয় মতবিরোধ.....২১৯
উপসংহার.....২২১
উমাইয়া খলিফাদের নাম ও খেলাফতকাল.....২২৮
আরবি ভাষায় লিখিত গ্রন্থপঞ্জি.....২২৯
ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থপঞ্জি.....২৩২

লেখকের ভূমিকা

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ইতিহাস-বিষয়ক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে উমাইয়া খেলাফতের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস। বাস্তবতা হচ্ছে, উমাইয়া শাসনামল এমন দিগন্তবিস্তৃত ইসলামি সাম্রাজ্যের জন্ম দিয়েছিল, যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং প্রদর্শন করেছে আপনাপন প্রতিক্রিয়া। এই সময়কালে সাধিত হয়েছে জাতীয় ও সামাজিক বিভিন্ন বিপ্লব; ঘটেছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি; যা এর যাত্রা ও পথচলাকে করেছে ধারালো ও গতিশীল। এসব অগ্রগতির মূল কারণ ছিল—আকিদা-বিশ্বাস ও মুসলিম সমাজে এর মৌলিক প্রভাব।

এজন্যই আমরা দেখতে পাই, সূচনা থেকে পতনকাল পর্যন্ত উমাইয়া সাম্রাজ্য ইতিহাসে প্রাচীন ও সমকালীন বহু ইতিহাসবিদের ভেতর তৈরি করে রেখেছে একধরনের রহস্য ও জটিলতা। এ থেকেই তাদের রচনায় জন্ম নিয়েছে একপ্রকার অস্পষ্ট গোলকধাঁধা। ফলে স্বভাবতই উমাইয়াদের ঐতিহাসিক আখ্যান হয়ে পড়েছে অবহেলিত। এর পেছনে কয়েকটি বড় কারণ আছে। যেমন:

ক. ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রমের সূচনাপর্বে উমাইয়াদের অনেকে শত্রুতা ও বৈরী মনোভাব দেখিয়েছিলেন। তারা বিরোধিতার পতাকা ধারণ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন প্রথম যুগের মুসলিমদের ওপর। অনেক পরে মক্কা বিজয়কালে তারা ইসলামের শান্তিময় ছায়াতলে আসেন। তাই উমাইয়াদের প্রতিপক্ষরা তাদের ক্ষতিসাধন ও তাদের ওপর অপবাদ আরোপের জন্য ইসলামের সূচনালগ্নে তাদের বৈরী অবস্থানকে মোক্ষম সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

খ. রাজনৈতিক পরিস্থিতি উমাইয়াদের আহলে বাইতের সঙ্গে এমন রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে ইতিহাসে উঠে আসতে বাধ্য করেছিল; যার সূচনা হয়েছিল তৃতীয় খলিফা উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। স্বাভাবিকভাবেই অধিকাংশ মুসলিম মানসের আবেগ-অনুভূতি ছিল আহলে বাইতের প্রতি আকর্ষিত; নবি-পরিবারের প্রতি তাদের অন্তরে ছিল প্রগাঢ় ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ। এটাই উমাইয়াদের প্রতি, তাদের সুনাম-সুখ্যাতির

প্রতি সাধারণ মুসলিমদের মনে সৃষ্টি করেছে ঘৃণা ও বিরূপভাব। বনু উমাইয়ার কতিপয় শাসক দ্বারা এমন বড় বড় কিছু ভুল সিদ্ধান্ত সংঘটিত হয়েছে, যা মুসলিমদের আবেগ-অনুভূতিকে কঠিনভাবে নাড়া দিয়েছে এবং তাদের ঘৃণাবোধকে করে তুলেছে অধিকতর তীব্র ও ভয়াবহ। যেমন, কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা, পবিত্র দুই শহর মক্কা ও মদিনায় আক্রমণ; কতিপয় উমাইয়া খলিফার সুনাম-সুখ্যাতির ওপর এসব ঘটনা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল; যদিও তাদের ইতিবাচক অনেক অবদান ছিল।

গ. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইসলামি দলের ভেতরে বেড়ে গিয়েছিল উমাইয়াদের শত্রুসংখ্যা। এটা হজরত উসমানের হত্যাকাণ্ড, সিফফিনের যুদ্ধ, শিয়া-খারেজিদের যুদ্ধ, সালিসি সিদ্ধান্ত প্রত্যাশী ও সালিসি সিদ্ধান্ত অপছন্দকারী লোকদের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি ঘটনার ফলে দেখা দিয়েছিল।

ঘ. ইসলামি সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল উমাইয়া শাসনবিরোধী মানসিকতা। এই মানসিকতার প্রকট বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল উমাইয়াদের প্রতি হিংসাপরায়ণ কিছু লোক। বিশেষত তাদের কঠিন প্রতিপক্ষ বনু আব্বাস এসবের প্রচার-প্রসারে রেখেছে বিশেষ ভূমিকা। তারা তিলকে তাল করে ছোট ছোট ভুলকেও উপস্থাপন করেছে বড় করে। বিভিন্ন কল্পকাহিনি তৈরি ও আমদানি করে সেগুলো চালিয়ে গেছে। করে গেছে সেগুলোর প্রচার-প্রচারণা।

চ. এসব তথ্য লোকমুখে উচ্চারিত হতে হতে যখন সংকলন-যুগের সূচনা ঘটে, তখন অনুকরণপ্রিয় কিছুসংখ্যক ইতিহাসবিদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান ও বাছবিচার না করেই যেসব ঘটনা তাদের কাছে পৌঁছেছে, তা-ই লিখে গেছেন ইতিহাসের পাতায়। ফলে তাদের বইপত্র স্ববিরোধী বিভিন্ন কথাবার্তায় ভরপুর। (অবশ্য এসব থেকে মুক্ত ভিন্ন কিছু বইপত্রও রয়েছে।) তাদের এসব লেখাজোখা এমন তীব্র বিতর্কের জন্ম দেয়, যা মানুষের আবেগ-অনুভূতি, জানাশোনা এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে প্রচণ্ডভাবে আহত করেছে; যা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে এ-বিষয়ক সকল আলোচনার পথ।

ছ. উমাইয়াদের দুর্ভাগ্য যে, তাদের ইতিহাস রচিত হয়েছে তাদের প্রতিপক্ষ আব্বাসিদের শাসনামলে আব্বাসি অনুসারীদের হাতে। আব্বাসিরা বনু উমাইয়ার ইতিহাস বিকৃত-করণ, পরিবর্তন ও তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ মুছে ফেলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এসব কারণে তাদের সালতানাত এমনসব আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে, যেগুলোর টার্গেট ছিল

একে ইতিহাসের পাতা থেকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এমন কিছু শক্তি এসব আক্রমণ চালিয়েছিল, উমাইয়াদের প্রতি যারা ছিল বিক্ষুব্ধ, ক্রোধান্বিত।

উমাইয়া সালতানাতের সূচনালগ্ন থেকেই শিয়া সম্প্রদায় তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উঁচিয়ে ধরে। খেলাফতকে কেন্দ্র করে খেলাফতের প্রকৃতি ও মর্ম নির্ধারণ নিয়েই তাদের মধ্যে বিতর্কের সূচনা ঘটে। দু-পক্ষেরই লক্ষ্য ছিল খেলাফতের পদে সমাসীন হওয়া; যা তাদেরকে ক্রমাগত সামরিক ও রাজনৈতিক সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। শিয়া সম্প্রদায় বনু উমাইয়ার ক্ষতিসাধন ও পতনের লক্ষ্যে উমাইয়াদের শক্ত প্রতিপক্ষ বনু আব্বাসের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি। যেভাবে শাসন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উমাইয়াদের নীতি-আদর্শ খারেজিদের বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছে; তেমনই উদ্ভূত পরিস্থিতি খুব দ্রুত দ্বিমুখী বিভিন্ন সংঘাত ও সংঘর্ষের কবলে পড়েছে, যা আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর, মুখতার বিন সাকাফির মতো কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে ঠেলে দিয়েছে এমন কিছু রাজনৈতিক ও সামরিক আন্দোলনের সূচনা ঘটাতে, যেগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছে।

এই বিরোধিতার ক্ষেত্রে মাওয়ালিদেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাদের এ বিরোধ জন্ম নিয়েছিল আরবদের সাথে বেতনভাতা এবং আচরণিক ক্ষেত্রে আরবদের সাথে সমতা রক্ষা না হওয়ার কারণে। সবশেষে বিরোধিতার পতাকা হাতে তুলে নেয় বনু আব্বাস। তারা শিয়া, মাওয়ালি ও কিছু আরব গোত্রকে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নেয়, যারা ছিল উমাইয়াদের শাসননীতির প্রতি প্রবল প্রতিশোধপরায়ণ। তারা চাইছিল শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে এই শাসনক্ষমতার পতন ঘটাতে।

অনেক ইতিহাসবিদ উমাইয়া খেলাফত সম্পর্কে অনেক বইপুস্তক রচনা করেছেন। অনেক গ্রন্থপ্রণেতা এই শাসনক্ষমতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা ঘটিয়েছেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কখনো আবেগ-অনুভূতি কখনো-বা গতানুগতিক লেখাজোখায় প্রভাবিত হয়ে পান করেছেন একই ঘাটের পানি। সেজন্য ঘটনাগুলোর শেকড় পর্যন্ত যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু মৌলিক ইতিহাসকে হারিয়ে যেতে দেয়নি কিছু বস্তুনিষ্ঠ গবেষণাকর্ম ও সজাগ পর্যবেক্ষণ। তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শাঁস-সমেত তুলে এনেছেন বাস্তবতা, ফুটিয়ে তুলেছেন উমাইয়াদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বস্তুতান্ত্রিক অবদানসমূহ; যা তাদের ওপর থেকে 'ক্ষমতালোভী' অপবাদটি দূর করার জন্য যথেষ্ট।

বনু উমাইয়ার কিছুসংখ্যক লোক যদিও ইসলামি দাওয়াতের সূচনালগ্নে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন, ইসলামগ্রহণে বিলম্বের আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু মক্কা বিজয়কালে তারা ইসলামের ছায়াতলে এসে প্রদর্শন করে গেছেন উত্তম বীরত্ব ও সাহসিকতার নজির। তাওহিদের পতাকা সমুন্নত করার ক্ষেত্রে রেখেছেন অসামান্য অবদান। যে উদ্দীপনার সাথে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন, সেই একই উদ্দীপনায় ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসকে সংরক্ষণও করে গেছেন। এমনকি রাসুল ﷺ তাদের অনেকের ওপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও অর্পণ করেছিলেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ওহি লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন মুআবিয়া রা.-এর ওপর। রাসুলের পর ইসলামের তিন খলিফাও তাদের সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করে গেছেন।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, আমাদের কালের কতিপয় লেখক ও গবেষককে পেয়ে বসেছে পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি। অবশ্য সচেতন চিন্তা ও চেতনাদীপ্ত অধ্যয়নের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কিছু লেখকও আছেন, যারা সন্তর্পণে এদের পক্ষপাতদুষ্ট বিভিন্ন গুজবকে পাশ কাটিয়ে চলছেন।

এতকিছুর পরেও মৌলিক ইতিহাসে প্রত্যাবর্তন এবং সুচিন্তিত অধ্যয়ন আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে বনু উমাইয়ার ঐতিহাসিক বাস্তবতা তুলে ধরার, সঠিক ইতিহাস বের করে আনার এবং যোগ্য লোকদের উপযুক্ত আসনে সমাসীন করার। যদিও উমাইয়া শাসনামলের কোনো কোনো খলিফা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির দ্বারা কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু শুধু এইটুকুই তো তাদের ইতিহাস নয়, তাদের শাসনামলের ইতিহাস তো আরও বিস্তৃত, যা ইসলামি ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবের অংশ। উমাইয়া শাসকরা ইতিহাসে যেসব বিজয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন, নির্মাণ করেছেন যে গৌরবের ইতিহাস, ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি থেকে সেগুলোকে পৃথক করা কি কখনো সম্ভব? রিসালাতের সময়কাল থেকে এগুলোই ছিল মুসলমানদের চালিকাশক্তি।

উমাইয়া শাসনকাল সম্পর্কে রটে গেছে নানারকম মিথ্যা বর্ণনা, একে দেওয়া হয়নি তার প্রাপ্য ইনসাফপূর্ণ অবস্থান ও অধিকার। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, উমাইয়া শাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ আদর্শবান ছিলেন না। সত্যি বলতে কী, প্রতিটি রাষ্ট্রেরই সংরক্ষণ ও স্মরণীয় করে রাখার মতো কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণীয় দিক অবশ্যই থাকে।

লক্ষণীয় যে, আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়া সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে উমাইয়া খেলাফতের নিরেট ইতিহাস জনসম্মুখে নিয়ে আসার জন্য একটি বিশেষ জ্ঞানগর্ভ গবেষণাকর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। এ বিষয়টিই পাঠকদের সামনে বাস্তবতা ও প্রকৃত অবস্থার নিকটতর চিত্র তুলে ধরার জন্য এ-সংক্রান্ত লেখা প্রস্তুত করতে আমাদের তাড়া দিয়েছে। আমরা সুচিন্তিতভাবে সেসব অবস্থা ও ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ তুলে ধরব, যার ভেতর দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করেছে উমাইয়া শাসনব্যবস্থা; যাতে পাঠকদের সামনে ইসলামি ইতিহাসের এই দিকগুলো সুস্পষ্ট ও উন্মোচিত হয়ে ওঠে; পাঠক যাতে জানতে পারে, বনু উমাইয়া ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য কী বিশাল খেদমত উপহার দিয়েছে এবং আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত মূল্যবান সম্পদগুলোর সুরক্ষায় কী পরিমাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। আমরা আশা করছি, বনু উমাইয়া সম্পর্কে আরব স্কলার ও ইসলামি প্রজন্মের ভেতর যে ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, তা পরিণত হবে সঠিক ধারণায় এবং বিকশিত হয়ে উঠবে প্রকৃত অবস্থা। এ গ্রন্থে আমি তেমন বিস্তারিত আলোচনায় যাইনি; কেবল সেটুকুই আলোচনা করেছি, যেটুকু বাস্তবতা তুলে ধরতে কিংবা সঠিক প্রমাণ বহন করার জন্য যথেষ্ট। যে ইতিহাসের ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন ডালপালা ও শাখা-প্রশাখা, সেটির মূল জায়গায় গমন ব্যতীত বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা কখনো সম্ভব নয়। বিশেষত, উপদেশ ও নসিহতের নিয়তে আমরা যখন এমন বিষয়ে হাত দিয়েছি, যার মধ্যে আছে চিন্তার আধিক্য, ব্যাপক তথ্য-উপাত্ত এবং বিভিন্ন অভিমতের ছড়াছড়ি; সেখানে তো মূল জায়গায় হাত না দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা আরও বেশি দুরূহ।

নিঃসন্দেহে ইতিহাস ও তার উত্থান-পতনের ঘটনাবলি পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উপদেশ গ্রহণ, ভবিষ্যতে উপকৃত হওয়ার জন্য অতীত থেকে কল্যাণকর শিক্ষাগুলো আহরণ। তাই একজন ইতিহাস-গবেষকের জন্য গবেষণাকর্ম চলাকালে এমনসব কার্যকারণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা জরুরি, যা তার গবেষণায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। সঠিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ থেকে রাখতে পারে বিরত এবং ইতিহাসের বাস্তবতায় পৌঁছার ক্ষেত্রে হয়ে উঠতে পারে বিশাল বাধা। কেবল তখনই ভবিষ্যতে উপকৃত হওয়ার জন্য অতীত অভিজ্ঞতাগুলোকে বর্তমানের জন্য নিখুঁত বর্ণনায় উপস্থাপন করা সম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

এই গবেষণাগ্রন্থ প্রস্তুত করতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক রচনা ও বইপত্রে আমি নির্ভর করেছি, তার কয়েকটি হলো : *তারিখু খলিফা ইবনু খাইয়াত*, ইবনে

আবদুল হাকামের *ফুতুহু মিসর*, বালাজুরির *ফুতুহুল বুলদান*, *তারিখুত তবারি*, আল্লামা ইবনে আসিরের *আল-কামিল*, ইবনে কাসিরের *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ইবনে উজারার *আল-বায়ানুল মুগরিব*, এ ছাড়াও আহলে সুন্নত ওয়াল-জামাতের ভারসাম্যপূর্ণ লেখকদের মৌলিক রচনাসমূহ। তবে শিয়া সম্প্রদায় দ্বারা প্রভাবিত হিসেবে পরিচিত ইয়াকুবি, মাসউদি এবং ইবনে তবাতবার মতো ইতিহাসবেত্তাদের রচনাবলি থেকেও আমি বেখবর থাকিনি।

আমি আশাবাদী যে, আমার এই প্রামাণ্যগ্রন্থ তুলে ধরবে ইতিহাসের নিরেট বাস্তবতা। পাশাপাশি আশা করছি, এই সামান্য গবেষণাকর্ম ইলমি অনুসন্ধান ও গবেষণার শর্ত অল্প হলেও পূরণ করবে। পাঠকদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করবে জীবন্ত ও কল্যাণকর বিষয়াবলি।

বিষয়বস্তুর গঠনবিন্যাস—পাঠকবৃন্দ খানিক পরে যে বড় বড় শিরোনামে দেখতে পাবেন, সেগুলো আমি ভাগ করেছি আটটি পরিচ্ছেদে। প্রথম পরিচ্ছেদে স্থান পেয়েছে উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা, হজরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের কার্যাবলি, তার শাসনামলে সংঘটিত অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়সমূহ, শাসন পরিচালনা-সংক্রান্ত তার গৃহীত নীতিমালার বিবরণ, তার পররাষ্ট্রনীতি ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে আচরণিক সম্পর্ক। শেষে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টার আলোচনার মাধ্যমে ইতি টেনেছি এই পরিচ্ছেদের।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এসেছে উমাইয়া সাম্রাজ্যের তিন ব্যক্তি—ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া, ইয়াজিদ-পুত্র মুআবিয়া ও মারওয়ান বিন হাকামের আলোচনা। উমাইয়া শাসনের বিশিষ্ট ব্যক্তি খলিফা ইয়াজিদের শাসনামলে সংঘটিত সেসব জটিল ঘটনাবলির আলোচনা, যা মুসলিম উম্মাহকে করে দিয়েছে বহুধাবিভক্ত। যেমন, কারবালা ট্রাজেডি, হাররার ঘটনা, মদিনায় আক্রমণ, মক্কা অবরোধ এবং মক্কার ভেতর মানজানিকের মাধ্যমে পাথর নিক্ষেপসহ ইয়াজিদের শাসনকালে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কিত সামরিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলির বিবরণ। আরও এসেছে স্বল্পকালীন শাসনকার্য পরিচালনাকারী মুআবিয়া বিন ইয়াজিদের খেলাফতকালে ইসলামি বিশ্বের মন্দ পরিস্থিতির আলোচনা, যার দরুন তিনি খেলাফতের পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় নিজেকে মুসলিমদের সমস্যাবলি সমাধানে সক্ষম অনুভব করছিলেন না। এমতাবস্থায় অস্থির বনু উমাইয়া যখন দেখতে পায়, তারা প্রবহমান বিভিন্ন স্রোতের কবলে পড়ে গেছে, তখন পতনোন্মুখ খেলাফত উদ্ধারের লক্ষ্যে রাজকর্মচারীদের নিয়ে জাবিয়ায় একটি সমাবেশ করতে বাধ্য হয়। আলোচনা

শেষে সকলে মারওয়ান বিন হাকামের হাতে বাইআত হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে; যাতে তিনি উমাইয়া পরিবারে খেলাফত রক্ষার প্রয়াস চালান এবং মুসলিমবিশ্বকে ঐক্যসূত্রে গেঁথে নেন। মারওয়ান তার মৃত্যুর আগে এ ক্ষেত্রে আংশিক সফল হয়েছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের ব্যক্তিত্ব, অভ্যন্তরীণ ঘটনাসমূহ, পররাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রের সকল কর্মকাণ্ড। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নামার পর, তার শাসনব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এমনসব আন্দোলন নির্মূল করে তিনি মুসলিমবিশ্বের ঐক্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। বিশেষত তাওয়াবিন, আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর, মুখতার বিন আবু উবাইদ সাকাফি, খারেজি গোষ্ঠী ও ইবনে আশআসের আন্দোলন গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। পররাষ্ট্রনীতিতে মনোযোগ দেওয়ার পর দেখা দেওয়া অব্যাহত অস্থিরতা ও গোলযোগ—যা সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের অর্ধাংশকে ছেয়ে ফেলেছিল, এর ফলে তিনি মুসলিমদের বিজয়াভিযান সম্প্রসারণ করার সুযোগ পাননি। পররাষ্ট্রনীতিতে রাষ্ট্র সম্প্রসারণই ছিল আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনি শাসনকাঠামোকে বেশ উন্নত করে তুলেছিলেন। খেলাফতে বনু উমাইয়ার প্রথম স্থপতি মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা.-এর পর তাঁকেই মনে করা হয় এর দ্বিতীয় স্থপতি। কারণ, সাম্রাজ্যের লোকদের পারস্পরিক বন্ধন ও মুসলিমবিশ্বের ঐক্য ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তিনি বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে থাকছে ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের ব্যক্তিত্বের আলোচনা, যে ব্যক্তিত্ববলে তিনি বিশাল সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে বিভিন্ন অঞ্চল বিজয় যেমন : মা-ওয়ারাউন্নাহারের ভূখণ্ডসমূহ, সিন্ধু, মরক্কো ও স্পেনের বিজয়গুলো তার সময়ে পূর্ণতা পেয়েছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে এসেছে সুলাইমান বিন আবদুল মালিক, উমর ইবনে আবদুল আজিজ, ইয়াজিদ বিন আবদুল মালিক প্রমুখের আলোচনা; এসেছে তাদের শাসনকালে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বর্ণনা। এই শেষযুগেই প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে আব্বাসিদের দাওয়াত ও উত্থান।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রয়েছে হিশাম বিন আবদুল মালিকের ব্যক্তিত্ব এবং তার শাসনকালে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পূর্ব-পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়া অস্থিরতা ও হাঙ্গামার বিবরণ। তার সময়কালেই চারদিকে প্রাণময় হয়ে ওঠে আব্বাসীয় বিপ্লব। তার শাসনামলের শেষদিকেই প্রকাশ পেতে শুরু করে উমাইয়া সালতানাতের দুর্বলতার কারণসমূহ।

সপ্তম পরিচ্ছেদে স্থান পেয়েছে ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদ, ইয়াজিদ ইবনে প্রথম ওয়ালিদ ও মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ আল-জুদির ব্যক্তিত্ব-সংক্রান্ত আলোচনা। তাদের সময়েই বিরাজ করছিল ব্যাপক অস্থিরতা ও ভয়াবহতা। একদিকে পারিবারিক মতভিন্নতার দরুন পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যটি ভেঙে হয়ে যাচ্ছিল খণ্ডবিখণ্ড, অন্যদিকে বেড়ে উঠেছিল গৃহযুদ্ধ, যা আরব গোত্রপ্রীতি ও পক্ষপাতদুষ্টতাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল কয়েকগুণ। আব্বাসিদের কর্মতৎপরতা এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তারা মারওয়ান বিন মুহাম্মদকে খতম করতে এবং উমাইয়া খেলাফতের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে খোরাসানিদের দিকে সম্প্রসারিত করেছিল সহযোগিতার হাত।

অষ্টম পরিচ্ছেদে আমি উমাইয়া খেলাফতের দুর্বলতা এবং তার পতনের কারণগুলো চিহ্নিত করার প্রয়াস চালিয়েছি। আমার বিশ্বাস, এই গ্রন্থে ঘটনাবলির পর্যালোচনায় সম্মানিত পাঠকবৃন্দ যেমন লক্ষ করবেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা, তেমনই পাবেন আনন্দ ও কল্যাণের বিপুল সামগ্রী। মহান আল্লাহর নিকট কামনা—তিনি যেন এই বইটিকে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য কবুল করে নেন এবং আরব ও মুসলিম পাঠকদের এর দ্বারা উপকৃত করেন। তিনিই সর্বশ্রোতা এবং সর্বোত্তম উত্তরদাতা।

ড. মুহাম্মদ সুহাইল তাক্কুশ
১.১.১৯৯৬
বৈরুত

প্রথম অধ্যায়

মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা.

৪১-৬০ হিজরি/৬৬১-৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ

হজরত মুআবিয়া রা.-এর পরিচয়

তিনি মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান বিন সাখর বিন হারব বিন উমাইয়া বিন আবদে শামস বিন আবদে মানাফ বিন কুসাই আল-কুরাশি আল-উমাবি আবু আবদুর রহমান। মুমিনদের মামা, বিশ্ব-প্রতিপালকের প্রেরিত ওহির লেখক। তাঁর মাতা হিন্দা বিনতে উতবা বিন রবিয়াহ বিন আবদে শামস বিন আবদে মানাফ।[১]

মুআবিয়া রা.-এর জন্ম মক্কায়। মুহাম্মদ ﷺ রাসুল হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পাঁচ বৎসর আগে। ইসলামের ছায়াতলে আসেন মক্কা-বিজয়ের দিন। রাসুল তাকে কাতিবুল ওহি বা ওহি-লেখক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।[২] তিনি আবু বকর, উমর, উসমান ও স্বীয় বোন উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা রা. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। বুখারি ও মুসলিমসহ হাদিসের অন্যান্য কিতাবে স্থান পেয়েছে তার বর্ণনাকৃত হাদিস। তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন একদল সাহাবি ও তাবিয়ি।[৩]

মুআবিয়া রা. ইয়ামামা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরে আবু বকর রা. শামে সেনাদল পাঠালে তিনিও তাঁর ভাই ইয়াজিদের সঙ্গে ওই অভিযানে রওনা হন এবং সমুদ্র উপকূলীয় শহর সইদা, ইরাকা, জাবিল, বৈরুত, আক্কা, টায়ার ও কায়সারিয়া বিজয়ের ক্ষেত্রে অনন্য বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন।[৪]

মুআবিয়া উমর রা.-এর আস্থা অর্জন করলে তিনি তাকে জর্ডানের গভর্নর নিযুক্ত করেন, যেভাবে ইতিপূর্বে তাঁর ভাই ইয়াজিদকে শামের গভর্নর

[১] ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/২০-২১।

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২১।

[৩] ইবনে হাজার আসকালানি, ফাতহুল বারি : ৮/১০৫।

[৪] আল-বালাজুরি, ফুতুহুল বুলদান : ১৭৩।

বানিয়েছিলেন। পরে আমওয়াস মহামারিতে ইয়াজিদের মৃত্যু ঘটলে তার অঞ্চলগুলোও মুআবিয়ার অধীনে দিয়ে দেন।[৫]

উসমান রা. খেলাফতের পদে সমাসীন হলে মুআবিয়াকে পুরো শামের নেতৃত্ব দিয়ে দেন। উসমানের শাহাদতের পর তিনি শামের নিরঙ্কুশ শাসক হয়ে ওঠেন।[৬]

আলি রা.-এর হাতে খেলাফতের বাইআত গ্রহণ শুরু হলে মুআবিয়া আলির বিরুদ্ধে তাঁর সেনাদলে উসমানের খুনিদের আশ্রয়দানের অভিযোগ তুলে বাইআত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। এদিকে শামবাসী উসমানের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার এবং আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধের শর্তে মুআবিয়ার হাতে বাইআত গ্রহণ করে।[৭]

আলি ও মুআবিয়ার মধ্যে এই বিরোধ চলা অবস্থায়ই ৪০ হিজরি মোতাবেক ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে আলি রা. শাহাদত বরণ করেন।[৮] আলির মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে হাসান খলিফা হলে হাসান ও মুআবিয়ার মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। পরে হাসান রা. নিজে থেকে মুআবিয়া রা.-এর জন্য খেলাফতের পদ ছেড়ে দেন।[৯]

মুআবিয়া ছিলেন আরবের একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি, রাজনীতি-বিশেষজ্ঞ, জাগতিক বিষয়ে জ্ঞানী, ধৈর্যশীল, শক্তিমান, নীতিনিষ্ঠ, রাষ্ট্রপরিচালনায় দক্ষ পরিচালক, প্রজ্ঞাবান, বিশুদ্ধভাষী ও আলংকারিক। যেখানে ধৈর্যের প্রয়োজন সেখানে ধৈর্য, যেখানে কঠোরতার প্রয়োজন সেখানে কঠোরতা প্রদর্শনই ছিল তাঁর নীতি। তবে তার স্বভাবজাত ধৈর্য গুণটি ছিল তুলনামূলক বেশি। তিনি ছিলেন দানবীর, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বপ্রিয় ব্যক্তি।[১০]

তাঁর প্রজাদের মধ্যকার সম্ভ্রান্ত লোকদের চেয়েও তাঁকে বেশি মর্যাদা দেওয়া হতো। কুরাইশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ[১১] যখনই দামেশকে তাঁর কাছে যেতেন, তিনি তাদের সম্মান দিতেন। তাদের চাহিদা ও দাবিদাওয়া পূরণে সচেষ্ট থাকতেন। তাঁরা কিন্তু তাঁর সঙ্গে কঠিন ভাষায় কথা বলতেন, কখনো বিরূপ

---

[৫] আত-তবারি, তারিখুর রুসুল ওয়াল-মুলুক : ৪/৬২।

[৬] ইবনে কাসির : ৮/২১।

[৭] আল-ইয়াকুবি, তারিখুল ইয়াকুবি : ২/৮৩; আত-তবারি : ৪/৪৪৪।

[৮] আলি রা. ৪০ হিজরি সনে রমজান মাসের শেষ দশকে শাহাদত বরণ করেন। কেউ বলেন, ১৭ তারিখ। তারিখু খলিফা ইবনু খাইয়াত : ১/১৮২; আত-তবারি : ৫/১৪৩।

[৯] ইবনে কাসির : ৮/১৬।

[১০] ইবনে তকতকা, আল-ফাখরি ফিল আদাবিস সুলতানিয়া ওয়াদ দুওয়ালিল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা : ১০৪।

[১১] যেমন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ও আবু তালিব পরিবারের অনেকে। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

মনোভাব নিয়ে মুখোমুখি হতেন, কিন্তু তিনি কখনো তাদের সঙ্গে কৌতুক করতেন, কখনো উদাসীন থাকার ভান করতেন। শেষে মূল্যবান পুরস্কার ও দামি উপঢৌকন দিয়ে তাদের বিদায় করতেন।[১২]

এসব গুণের কারণেই মুআবিয়া সাধারণভাবে জেদি মুসলিমদের এবং বিশেষ করে অবাধ্য খারেজিদের নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন; মুসলিম উম্মাহকে গভীর প্রজ্ঞায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উমাইয়া খেলাফতের প্রতিষ্ঠা

আলি রা.-এর শাহাদতের ফলে খেলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার পথ মুআবিয়ার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। আলি রা. হজরত মুআবিয়ার জন্য খেলাফতের কপাট খুলে না গেলে তাঁর জন্য খেলাফতের কক্ষে প্রবেশ বেশ কঠিনই হতো। কারণ, রাজনৈতিক আবহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মতভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে লোকজন হাসান ইবনে আলির হাতে বাইআত গ্রহণ শুরু করে দিয়েছিল। অপরদিকে বাইতুল মাকদিসে শামবাসীরা মুআবিয়ার হাতে খেলাফতের বাইআত দিয়ে তাকে আমিরুল মুমিনিন বলে ডাকতে শুরু করেছিল। যদিও এর বেশ আগে সালিশদের বৈঠকের দিন তার খলিফা হওয়ার কথা একরকম ঘোষিত হয়ে গিয়েছিল।[১৩]

মুআবিয়া দ্রুত ইরাকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করলে হাসানের কাছে এর সংবাদ পৌঁছে যায়। তিনি তখন কুফায় অবস্থান করছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি ১২ হাজার সৈন্যসহ কাইস বিন সাদ বিন উবাদা আল-আনসারির নেতৃত্বে মাদায়েন অভিমুখে রওনা দেন। তাদের সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসও ছিলেন। মাদায়েনের সাবাতে পৌঁছলে তার অনুসারীদের মধ্যে এ সন্দেহ ছড়িয়ে পড়ে যে, তার বাহিনীর সেনাপ্রধান মুআবিয়ার পক্ষ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেছেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মনকেও মুআবিয়া নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন।[১৪] ফলে মুআবিয়া ও তার বাহিনীর মোকাবেলা করার কোনো সামর্থ্য তার থাকেনি। হাসান তখন বুঝতে পারেন, ইরাকি ও শামি বাহিনীর সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিমত্তার মধ্যে সমতাবিধান কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। তাই এক রক্তাক্ত ফিতনা থেকে মুসলিমদের বাঁচানোর

---

[১২] ইবনে তকতকা : ১০৪; ইবনে কাসির : ৮/১৩৭।

[১৩] ইবনে কুতাইবা, আল-ইমামাতু ওয়াস-সিয়াসা : ১/১৬৩; আত-তবারি : ৫/১৬১।

[১৪] উৎকোচের ব্যাপারটি আমরা কোনো ইতিহাসে পাইনি। এই তথ্যের জন্য লেখকের টীকা দেওয়া জরুরি ছিল। (সম্পাদক)

জন্য তার মনে দয়ার উদ্রেক ঘটে। তিনি তখন মুসলিমদের জীবনের সুরক্ষার দেওয়ার লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার নীতিকেই প্রাধান্য দেন। বিশেষ করে কুফাবাসীর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। কারণ, তাদের একদল তখন তার বিরোধী হয়ে ওঠে, তার ওপর কুফরের অপবাদ আরোপ করে, তাকে আক্রমণ করে আহত করে ফেলে।[১৫]

হজরত হাসান ও মুআবিয়ার মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর হাসান রা. নিজেকে খেলাফতের দাবি থেকে সরিয়ে নেন। তিনি এ শর্তে মুসলিমদের যাবতীয় দায়দায়িত্ব হজরত মুআবিয়ার হাতে তুলে দেন যে, এরপর সব বিষয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। অন্য বর্ণনায় আছে, হাসান মুআবিয়ার সঙ্গে এই শর্তে সন্ধি করেছিলেন, হজরত মুআবিয়া যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন তিনিই থাকবেন খলিফা। তার মৃত্যুর পর খলিফা হবেন হাসান।[১৬]

এই সন্ধির পর মুআবিয়া রা. কুফায় প্রবেশ করলে হাসান ও হুসাইন রা. তার হাতে বাইআত নেন। ফলে কুফার লোকজন তার কাছে এসে সমবেত হয়। এজন্য এই বছরকে (৪৯ হিজরি) আমুল জামাআত বা লোকদের সমবেত হওয়ার বছর বলা হয়ে থাকে। কারণ, এ বছরই দীর্ঘদিন পর মুসলিম উম্মাহ একজন খলিফার অধীনে সমবেত হয়।[১৭] একমাত্র খারেজিরাই বাইআতগ্রহণের বাইরে ছিল। তারা তাঁর হাতে বাইআত নিতে রাজি হচ্ছিল না।

এভাবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে উমাইয়া খেলাফত আর মুআবিয়া রা. হন মুসলিম উম্মাহর একক খলিফা। উমাইয়া খেলাফত স্থায়ী হয়েছিল হিজরি সন বিবেচনায় ৯১ বছর, খ্রিষ্টীয় সন হিসেবে ৮৯ বছর। ৪১-১৩২ হিজরি—৬৬১-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ। এই দীর্ঘ সময়ে খেলাফতের আসনে সমাসীন হন ১৪ জন খলিফা। প্রথমজন ছিলেন মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, শেষের জন ছিলেন মারওয়ান বিন মুহাম্মদ আল-জুদি।

মুআবিয়া রা.-এর রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি

হজরত মুআবিয়ার হাতে হাসান রা.-এর বাইআত ইসলামি ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর মাধ্যমে একদিকে গুটিয়ে যায় খেলাফতে রাশেদার সোনালি অধ্যায়, অপরদিকে সূচনা ঘটে উমাইয়া শাসনব্যবস্থার। পাশাপাশি দীর্ঘ

---

[১৫] আল-ইয়াকুবি : ২/১২২; আত-তবারি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৫৯।

[১৬] ইবনে কুতাইবা : ১/১৬৩; হুসাইন তহা, আলিইয়ুন ও বানুহু; পৃষ্ঠা : ৯৭৯।

[১৭] আল-ইয়াকুবি : ২/১২৩; ইবনে কাসির : ৮/১৬; ওফিয়া ইবনু খাইয়াত : ১/১৮৭; আত-তবারি : ৫/১৬৩; আবুল ফিদা, আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার : ১/১৮৩।

সংঘাত শেষে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রশ্নে বনু হাশিম চলে আসে প্রতিপক্ষের কাতারে। বনু উমাইয়ার নেক লোকদের হাতে সমাপ্ত হয় আরেকটি ধাপ। আমুল জামাআত বা ঐক্যের বছর থেকে মুসলিমবিশ্বে সূচনা ঘটে এক নতুন ইসলামি শাসনক্ষমতার, যা ফিরিয়ে আনে ইসলামের রাজনৈতিক ঐক্য। মুআবিয়া রা. খেলাফতের কেন্দ্রকে দামেশকে স্থানান্তর করার ফলে দামেশক হয়ে ওঠে এই নতুন সাম্রাজ্যের রাজধানী।[১৮]

মুআবিয়ার ব্যক্তিত্ব ছিল দিগন্তের চেয়েও বিস্তৃত, মহাসাগরের চেয়েও গভীর ও উদার। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল এমন এক ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার, যেখানে থাকবে শুধু ইনসাফ, সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব। বন্ধ হয়ে যাবে খুনাখুনি ও রক্তের সয়লাব। তাঁর একক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে সেই সাম্রাজ্য। এই মনোবাসনা বাস্তবায়নের জন্য রাজত্বকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভিত্তির ওপর দাঁড় করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ :

ক. রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কাঠামোগত কিছু পরিবর্তন আনেন। রাষ্ট্রের ভেতর স্থিতিশীলতা আনতে এবং অমুসলিমবিশ্বে ইসলামি সাম্রাজ্যের পরিধি সম্প্রসারণ করতে সৈন্যদলকে আমূল ঢেলে সাজান; তিনি শামের গভর্নর থাকাবস্থায়ই এই বাহিনীকে প্রস্তুত করে আনছিলেন।

খ. অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সংস্কার সাধন করেন। বিরোধীদের বশে আনেন। পরবর্তী খলিফার নিয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং গোত্রীয় সাম্য ও ঐক্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রশাসনে সংস্কার নিয়ে আসেন।

গ. সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের সন্তানদের মধ্য থেকে বড় বড় ইসলামি ব্যক্তিত্বদের, বিশেষত বনু হাশিমের প্রতি সদাচারণ করেন।

ঘ. মুসলিমবিশ্বের সব এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করেন। সাম্রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং প্রশাসনিক কর্মপরিচালনায় তার সহযোগিতার জন্য রাজনৈতিক অঙ্গন ও প্রশাসনে উপযুক্ত লোকদের নিয়োগ দেন।[১৯]

ঙ. রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ সরাসরি নিজে তত্ত্বাবধান করেন। মুসলিমদের কল্যাণ ও উপকারিতার সার্বিক তদারকির জন্য তাঁর পুরোটা সময় ও প্রচেষ্টা উৎসর্গ করেন।[২০]

---

[১৮] ড. ইবরাহিম বাইদুন, আত-তাইয়ারাতুস সিয়াসিইয়া ফিল কারনিল আওয়ালিল হিজরি, পৃষ্ঠা : ১৪৮।

[১৯] যেমন উতবা ইবনে আবু সুফিয়ান, মারওয়ান বিন হাকাম, সাইদ বিন আস, আমর বিন আস, মুগিরা ইবনে শুবা, মাসলামা বিন মিখলাদ ও জিয়াদ ইবনে আবিহি।

[২০] আল-মাসউদি মুআবিয়ার প্রতিদিনকার কার্যক্রমটি আলোচনা করেছেন। মুআবিয়া কীভাবে তাঁর পুরোটা সময় মুসলিমদের কাজে কাটাতেন তিনি এর ফিরিস্তি উল্লেখ করেছেন। আল-মাসউদি, মুরুজুয যাহাব ও মাআদিনুল জাউহার : ৩/৩৯-৪১।

চ. সম্প্রসারণ নীতি : এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য মুআবিয়া কাজে লাগিয়েছেন তার রাজনৈতিক প্রতিভা। তার ছিল প্রখর মেধা ও ধারালো ব্যক্তিত্ব। এ ছাড়াও তিনি স্থাপন করেন এমনসব সামাজিক সম্পর্ক, যার মাধ্যমে মিত্র ও সহযোগীদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করার পাশাপাশি প্রতিপক্ষদেরও দুর্বল করতে সমর্থ হন। তার নবপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে ঘিরে রেখেছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি। তাই তিনি দুটি কর্মপন্থা অবলম্বন করেন। এক. শামের মূল অধিবাসীদের, বিশেষত, সেখানকার খ্রিষ্টানদের মৈত্রীচুক্তির অধীনে নিয়ে আসা। দুই. আরবের শক্তিশালী গোত্রগুলির সঙ্গেও মৈত্রী স্থাপন করা। বিশেষ করে কাইসি ও ইয়েমেনি গোত্রদ্বয়ের মধ্যে।[২১] তারা তাঁকে শাসনক্ষমতায় উঠে আসতে সাহায্য জুগিয়েছিল। গড়ে তুলেছিল তার শাসনব্যবস্থার খুঁটি। কালব গোত্রের মাইসুনের সঙ্গে মুআবিয়ার বৈবাহিক সম্পর্ক এবং কালবেরই এক নারীর সঙ্গে তার পুত্র ইয়াজিদের বিবাহবন্ধন এই মৈত্রী সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে তুলছিল। এই মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন আমাদের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে একটি রাজনৈতিক দৃশ্যচিত্র, যে দৃশ্যচিত্র মুআবিয়া তৈরি করেছিলেন কালবের সাথে তার এই সাধারণ সম্পর্কগুলোর মধ্য দিয়ে।[২২]

---

[২১] জাহিলি যুগে শামে বসবাসকারী আরবরা কাইসি ও ইয়েমেনি নামক দুই দলে বিভক্ত ছিল। কাইসিরা ছিল উত্তর আরবের নিজার, তামিম, রবিআ ও মুজার গোত্রগুলো নিয়ে গঠিত; আর ইয়েমেনিরা গঠিত ছিল জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণ দিক থেকে হিজরতকারী এবং শাম ও বিজিত এলাকাগুলোতে বসতি স্থাপনকারী গোত্রগুলোকে নিয়ে। তন্মধ্যে ছিল আজদের গোত্রগুলো। কালব গোত্রটিও ইয়েমেনিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খিলাফত ও খেলাফতে রাশেদার যুগে জাহিলিয়াতের গোত্রপ্রীতি নিভে গিয়েছিল। কিন্তু ইসলামের ব্যাপক বিজয়াভিযানের পর আরব গোত্রগুলো বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়লে তারা সঙ্গে করে এই জাহিলি প্রথাকে উত্তর আরবে নিয়ে আসে। এরা নিজেদেরকে আদনানের দিকে সম্বন্ধ করত বিধায় এরা আদনানি নামে পরিচিতি লাভ করে। অন্যদিকে দক্ষিণ আরবের লোকজন নিজেদের সম্বন্ধ করত কাহতানের দিকে, তাই তারা কাহতানি নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। কালক্রমে এরা পৃথক দুটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। লিপ্ত হয় পারস্পরিক প্রতিযোগিতায়। এরা উমাইয়া খেলাফতের ভেতর রাজনৈতিক মনোভাব তৈরিতে বেশ প্রভাব বিস্তার করে।

[২২] কালব গোত্রের সাথে মুআবিয়ার বৈবাহিক সম্পর্ক তার রাজনৈতিক মৈত্রীবন্ধনকে জোরদার করেছিল। এ গোত্রের লোকেরা নিজেদেরকে যুবরাজের (ইয়াজিদের) মামা মনে করত। পরবর্তীতে এরাই শাসকের রক্ষীবাহিনী হয়ে ওঠে। কিন্তু বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ মুআবিয়া এইসব সম্পর্ককে গোত্রপ্রীতি বা স্বজাত্যবোধ হিসেবে সামান্যতম গুরুত্ব দেননি, তিনি কেবল এসব সম্পর্ককে কল্যাণের বিচারে গুরুত্ব দিতেন। তার লক্ষ্য ছিল, এসবের কারণে যেন এই আরবগোত্র তার আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের কাজে লাগে এবং এরা যাতে হয়ে ওঠে উমাইয়া শাসকগোষ্ঠীর প্রধান সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মুআবিয়া রা.-এর রাজনৈতিক কর্মপন্থায় ব্যবস্থাপনাগত ভিন্নতা এসেছিল। কিন্তু জুমহুর (বিরাটসংখ্যক) মুসলমানের ধারণা অনুযায়ী ইসলামি খেলাফত তখন রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। বাস্তবতা হলো, মুআবিয়া যদিও রাজত্ব চেয়েছিলেন, তারপরও তার আশা ছিল আরবদের একজন প্রধান ব্যক্তি হিসেবে ইতিহাসের আসনে

মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাবলি

ক. খারেজিদের আন্দোলন

সিফফিন যুদ্ধের পরিণতি ছিল সমগ্র ইসলামি বিশ্বের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার। উসমান বিন আফফানের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যে ধারার সূচনা হয়েছিল, এটি ছিল সে ধারার দ্বিতীয় বেদনাময় অধ্যায়। যুদ্ধে শামিদের পরাজয়ের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলে তারা আমর বিন আসের পরামর্শে তাদের বর্শার ডগায় কুরআন উঁচিয়ে ধরে। কৌশলটি বেশ কাজে লাগে। এতে আমর বিন আস ইরাকের লোকদের, বিশেষত, পরহেজগার ব্যক্তিদের ওপর কাঙ্ক্ষিত প্রভাব ফেলতে সক্ষম হন।[২৪]

দূরদর্শী আলি রা. এই ধোঁকা আঁচ করতে পেরে তাঁর অনুসারীদের এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। কিন্তু বিবেক তো পরের বিষয়, তাদের মাথা থেকে এর প্রভাব নামাতে পারেননি। তার অনুসারীদেরই একটা দল তাকে হুমকি দিয়ে বলতে থাকে, তিনি আল্লাহর কিতাবের ফয়সালায় ফিরে না এলে পরিস্থিতি খুব মন্দ হবে।[২৫] এভাবে অনুসারীদের বড় একটা অংশ তাঁর মতের বিরুদ্ধে চলে যায়। তারা তাঁকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করে ফেলে।

অপরদিকে তার অনুসারীদের মধ্যে আরেকটা দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এরা সালিশি সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করে বসে। তারা যতক্ষণ না আল্লাহর বিধানের বাস্তবায়ন ঘটে, ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে দৃঢ় অবস্থান নেয়। এরাই হচ্ছে ইতিহাস-ধিক্কৃত খারেজি বা বিদ্রোহী গোষ্ঠী।

যারা যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে ছিল, তাদের অনেকে যখন বুঝতে পারে এ সিদ্ধান্তের মধ্যে মুআবিয়ার বিজয় নিহিত রয়েছে, ফলে তারা এ থেকে কল্যাণ ও স্বার্থ তো পাবেই না, উপরন্তু হুমকির মুখে পড়তে পারে মনে করে নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসার ঘোষণা দেয়। এরপর পুনরায় যুদ্ধ শুরুর জন্য আলি রা.-

---

জায়গা করে নেওয়া। তার রাজত্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, তার শাসনব্যবস্থা একটি ধর্মীয় শাসনব্যবস্থা, যার সংবিধান হলো ইসলামি সংবিধান। এটাই ছিল সাম্রাজ্যের একমাত্র সংবিধান।

[২৪] আল-ইয়াকুবি : ২/৮৮; ইবনে আসির, আল-কামিল ফিত-তারিখ : ৩/১৩১।

[২৫] আত-তবারি : ৫/৪৯।

এর ওপর চাপপ্রয়োগ করতে থাকে। কিন্তু আলি রা. তাদের কথা মানতে অস্বীকৃতি জানালে তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা দিয়ে খারেজিদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেয়।[২৬]

সিদ্ধান্তগত এই বৈপরীত্যের ফলে আলি রা.-এর বাহিনী থেকে ১২ হাজার সৈন্যের একটি দল বিচ্ছিন্ন হয়ে ওখান থেকে হারুরা[২৭] গ্রামে চলে যায়। এ কারণেই এরা হারুরিয়্যাহ নামে পরিচিতি লাভ করে। সেদিন থেকেই ইসলামে একটি নতুন দল গড়ে ওঠে, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে ইসলামের ইতিহাসে যাদের সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে।

খারেজিদের কাছে মুআবিয়া আলির তুলনায় বেশি ঘৃণিত ছিলেন। কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল, মুআবিয়া ইসলামের গণ্ডি থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন। পক্ষান্তরে এদের পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণ সমাধানের সাড়া না পাওয়ায় মুআবিয়াও ছিলেন উদ্‌বিগ্ন। তারা কিছুতেই শান্তিপূর্ণ সমাধানে আসতে চাইছিল না। তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে এদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ করতে হয়।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, খেলাফতের কেন্দ্র কুফা থেকে দামেশকে স্থানান্তরিত হলে খারেজিদের অবস্থায়ও পরিবর্তন ও সংস্কার আসে। কেন্দ্র স্থানান্তরের ফলে হারুরিদের জন্য কুফা থেকে বসরা পর্যন্ত কর্মতৎপরতা চালানো কঠিন হয়ে ওঠে। অপরদিকে খারেজিদের আন্দোলন পরিপক্ক হয়ে ওঠার আগেই দলটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। শেরপর্যন্ত এটি একটি মতাদর্শগত দলে পরিণত হয়ে যায়।[২৮]

আমরা এখানে খারেজিদের পরস্পরবিরোধী দলগুলোর বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করব, যা তাদের সামরিক শক্তিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল এবং উমাইয়াদের তাদেরকে নির্মূল করার সুযোগ করে দিয়েছিল। নাহরাওয়ানের যুদ্ধই ছিল প্রথম ও শেষ যুদ্ধ, যেখানে খারেজি গোষ্ঠী এক কমান্ডের অধীনে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এরপর তাদের মধ্যকার ঐক্য ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।[২৯]

কুফার খারেজিরা ফারওয়া বিন নওফালের নেতৃত্বে হাসান ও মুআবিয়ার মধ্যে সংঘটিত শান্তিচুক্তির ওপর আপত্তি উত্থাপন করে কুফার দিকে চলে যায়। তারা

---

[২৬] রিয়াদ ইসা, আল-হাজবিইয়াতুস সিয়াসিইয়া মুনজু কিয়ামিল ইসলামি হাত্তা সুকুতিদ দাওলাতিল উমাবিইয়া : ৯১।

[২৭] কুফার একটি গ্রামের নাম। ২৩. আল-ইয়াকুবি : ২/৯২; ইবনে আসির : ৩/১৬৫।

[২৮] রিয়াদ ইসা, পৃষ্ঠা : ১১৩।

[২৯] নাশআতুল হারাকাতিল আবাদিইয়া : ৩৪।

নাখিলা নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করে। এদের বশে আনার লক্ষ্যে মুআবিয়া একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। ফলে এখানে অবস্থানরত খারেজিদের ও মুআবিয়া-বাহিনীর মধ্যে বেশ কিছু সংঘাতের ঘটনা ঘটে।[৩০]

মুসতাওরিদ বিন আলকামার নেতৃত্বে সংঘটিত ৪৩ হিজরি—৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দের আন্দোলনকে মুআবিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত সর্ববৃহৎ আন্দোলন বলে মনে করা হয়। কুফায় নিযুক্ত উমাইয়া গভর্নর মুগিরা বিন শুবা রা. ওয়াসিত ও বসরার মধ্যবর্তী মাজার নামক স্থানে এদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। নেতাদের হত্যা করে এদের কর্মতৎপরতা গুঁড়িয়ে দেন। এভাবে তিনি কুফা থেকে এদের সব ঝুঁকি ও হুমকি মিটিয়ে ফেলেন। এ মিশন বাস্তবায়নে যেসব বিষয় তাকে সাহায্য জুগিয়েছিল, তা হলো খারেজি ও কুফাবাসীর মধ্যে গোত্রীয় বিভাজন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর শক্তিমত্তা, ইরাকে এদের বিরুদ্ধে পরিচালিত রাজনৈতিক কৌশল, কুফাবাসী কর্তৃক আলি রা.-এর পরিবারকে সমর্থন করার দিকে মনোযোগী হওয়া। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, খারেজিরা একাধিকবার যুদ্ধে কুফাবাসীকে নিজেদের পক্ষে টানার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। কিন্তু প্রতিবার তাদের ব্যর্থ হতে হয়েছে। উপরন্তু কুফাবাসীরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে খারেজিদের প্রতিহত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে।[৩১]

এরপর কুফার খারেজিরা কয়েক বছর শান্ত থাকার নীতি গ্রহণ করে। একপর্যায়ে ৫৮ হিজরি—৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে হাইয়ান বিন জুবইয়ান সুলামির নেতৃত্বে উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তী বছর বানকিয়া নামক স্থানে এদের সকলের নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে সেই বিদ্রোহ পরিণতিতে পৌঁছে।[৩২]

বসরার খারেজিদের কর্মপন্থা ছিল তাদের সমগোত্রীয় কুফার খারেজিদের কর্মপন্থার অনুরূপ। একের পর এক দুর্যোগ নেমে আসা সত্ত্বেও একমুহূর্তের জন্য তারা শান্ত থাকেনি। ইরাকে ৪১ হিজরি—৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে আরেকবার এদের ভয়াবহ তৎপরতা জেগে ওঠে। এরা তখন সাহম বিন গালিব ও খতিম বাহিলির নেতৃত্বে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে আসে। এমতাবস্থায় উমাইয়া গভর্নর ইবনে

---

[৩০] এই সংঘর্ষ সম্পর্কে দেখুন : আল-ইয়াকুবি : ২/১২৩, খলিফা ইবনু খাইয়াত : ১/১৮৮, আত-তবারি ৫/১৩৩,১৭৩-১৭৪।

[৩১] রিয়াদ ইসা, পৃষ্ঠা : ১১৭-১১৮।

[৩২] জুলিয়াস ক্যাসহাউসেন : আদ-দাওলাতুল আরাবিইয়া ও সুকুতুহা : ৫৮-৫৯।

আমির এদের মুখোমুখি হয়ে পুরোপুরিভাবে পদানত করে ছাড়েন।[৩৩]

তিনি এদের সাথে নরম আচরণ করেন বলে জানা যায়। এ কারণে মুআবিয়া তাকে ৪৫ হিজরি—৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বরখাস্ত করে তার স্থলে জিয়াদ ইবনে আবিহিকে বসরার গভর্নর করেন। তিনি খারেজিদের সাথে কঠোর আচরণ, ব্যাপক ধড়পাকড় ও হত্যার মাধ্যমে তাদের বশীভূত করে নেন।[৩৪] কিন্তু ৫৩ হিজরি—৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু ঘটলে এরা ফের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এরপর হিজরি ৫৫ সনে মুআবিয়া কর্তৃক বসরার গভর্নর হয়ে আসেন জিয়াদ তনয় উবাইদুল্লাহ। তিনি এদের প্রতি মনোযোগ দিয়ে অনেককে হত্যা ও অনেককে বন্দি করে নেন।[৩৫]

এভাবে উবাইদুল্লাহ বসরার গভর্নরের পদে সমাসীন থেকে খারেজিদের দমন ও নির্মূল করতে থাকেন। এর ভেতর একদিন ইনতিকাল করেন মুআবিয়া রা.। এভাবে হজরত মুআবিয়ার শাসনামলে দীর্ঘকাল গভর্নরদের কঠোর আচরণ ও চাপে থাকা সত্ত্বেও শান্ত থাকতে পারেনি ইরাক ভূখণ্ড।

খ. শিয়া আন্দোলন

খারেজিদের হুমকি ছাড়াও মুআবিয়া রা. বসরা ও কুফায় আলি ইবনে আবু তালিবের সমর্থক শিয়াদের ভয়াবহ ফিতনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। মুআবিয়ার সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর হাসান তখনও ইরাক ভূখণ্ড ত্যাগ করেননি, এর মধ্যেই তিনি ইরাকবাসীর সামনে পেশ করেন আসন্ন ভয়াবহ বিপদের কথা। তিনি তার পরিবারকে বোঝাতে চাচ্ছিলেন, এই এলাকা উমাইয়া শাসনের জন্য রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম দিতে পারে। তখন যেসব ইরাকি নিজেদের অপছন্দ সত্ত্বেও স্রেফ বাধ্য হয়ে, আন্তরিকতার সঙ্গে নয়, স্রেফ বাহ্যিকভাবে, ইসলামি সাম্রাজ্যের ঐক্যের ছায়াতলে এসেছিল, তারা বুঝতে পারে—তাদের জীবনপদ্ধতি পালটে গেছে। তাদের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠতে চলেছে কল্পনাতীত কঠিন ও ভয়াবহ।[৩৬]

এরপর কয়েক বছর অতিক্রান্ত হতেই তারা হাসানের নিকট মুআবিয়া ও তার গভর্নরদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অভিযোগ নিয়ে আসে এবং তাঁকে শামিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এই বলে উদ্বুদ্ধ করা শুরু করে যে,

---

[৩৩] আত-তবারি : ৫/১৭০-১৭১; ইবনে আসির : ৩/৩২৫-৩২৬।

[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২১৬, ২২২, ২২৮।

[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩১২-৩১৩।

[৩৬] জুলিয়াস ওয়েলহাউসেন, আল-খাওয়ারিজ ওয়াশ-শিয়া : ১১৩